ATMADEEP
An International Peer- Reviewed Bi- monthly Bengali Research Journal
ISSN: 2454–1508
Impact Factor: 4.5 (IIFS), 8.5 (IJIN)
Volume- II, Issue-IV, March, 2026, Page No. 1904-1913
Published by Uttarsuri, Sribhumi, Assam, India, 788711
Website: https://www.atmadeep.in/
DOI: 10.69655/atmadeep.vol.2.issue.04W.414

‘জিজ্ঞাসা’: বিজ্ঞান-দর্শন-সাহিত্যের ত্রিবেণী সঙ্গম

দেবী মন্ডল, *গবেষক, বাংলা বিভাগ, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত*

Received: 14.03.2026; Accepted: 16.03.2026; Available online: 31.03.2026
©2026 The Author(s). Published by Uttarsuri. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Abstract

In Bengali prose literature, Ramendrasundar Tribedi occupies an important place. His essay collection ‘Jijnasa’ presents a unique synthesis of science, philosophy, and literature. In this work, he attempts to explore humanity’s eternal questions, the pursuit of knowledge, and the mysteries of the universe. Firstly, the scientific perspective in ‘Jijnasa’ is very clear. The author explains various scientific topics through logic, observation, and analysis. Subjects such as nature, the universe, matter, and energy are examined in the light of scientific facts and theories. Through this method, Trivedi tries to cultivate a rational and inquisitive mindset among readers. Secondly, the depth of philosophy in this work is also remarkable. The author does not merely present information; rather, he reflects on its deeper meaning and significance. He expresses philosophical thoughts on issues such as human existence, the origin of the universe, and the nature of truth and knowledge. Thus, philosophy here is not simply a collection of ideas but a path toward deeper contemplation about life and the world. Thirdly, the literary beauty of ‘Jijnasa’ is especially captivating. The language is simple, lucid, and rich in expression. The essayist presents complex scientific and philosophical ideas in an elegant literary style. His use of metaphors, examples, and descriptive narration attracts readers and makes difficult concepts easier to understand. Therefore, in ‘Jijnasa’, science provides logical foundation, philosophy adds depth of thought, and literature makes the expression graceful and engaging. Through the harmonious blending of these three streams, the work truly becomes a confluence of science, philosophy, and literature.

Keywords: Inquiry (Jijnasa), Science and Literature, Ramendrasundar Trivedi, Philosophy, Science

বিজ্ঞানের সাধক, সাহিত্যের অনুরাগী রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর সৃজনশীল সৃষ্টিকর্মে দার্শনিক চিন্তার প্রতিফলন লক্ষিত হয়। বিজ্ঞানের যুক্তিনির্ভর দৃষ্টির দ্বারা বিশ্বপ্রকৃতির যে রূপ তিনি দেখতে চেয়েছেন, তা অনেকাংশে ব্যাহত হয়েছে। জগৎস্বরূপ সম্পর্কে তাঁর জ্ঞানের ক্ষুৎপিপাসার নিবৃত্তি যখন বিজ্ঞানের কাছে সফলকাম হল না তখন তিনি তার উত্তর খুঁজেছেন দর্শনের কাছে। সেই উত্তরও তাঁর মনঃপূত হয়নি। জগৎ-প্রকৃতি সম্পর্কে তাঁর এই ভাবনা জিজ্ঞাসার মধ্যে প্রকাশ করেছেন- যার অবয়বে বিজ্ঞান, অন্তরে দর্শন এবং প্রকাশে সাহিত্য। এই ত্রিবেণীর সার্থক সহাবস্থান হলো ‘জিজ্ঞাসা’ গ্রন্থ। ১৯০৪ সালে প্রকাশিত এই গ্রন্থে জগৎতত্ত্বের রহস্য সম্পর্কে লেখকের নানা জিজ্ঞাসা জগৎকে ভাবান্বিত করে তুলেছে। ইতিপূর্বে সাহিত্যরূপে বিভিন্ন মাসিক পত্রিকায়

প্রকাশিত এই গ্রন্থের সংকলিত প্রবন্ধগুলির মধ্যে লেখক জগৎ সৃষ্টির গোড়ার রহস্য সম্পর্কে বিভিন্ন জিজ্ঞাসা বিজ্ঞান ও দর্শনের আলোকে বিচার করেছেন— যা এই অংশের আলোচ্য বিষয়।

বাইশটি প্রবন্ধের সংকলন গ্রন্থ 'জিজ্ঞাসা'। সূক্ষ্ম বিষয়ভেদে প্রবন্ধগুলিকে চারটি শ্রেণীতে পর্যায়ভুক্ত করা যায়— বৈজ্ঞানিক, বিজ্ঞানে দর্শন, দর্শনে বিজ্ঞান এবং দার্শনিক প্রবন্ধসমূহ। বিজ্ঞান ও দর্শন বিষয়ক এই সকল প্রবন্ধের ভাষা বাংলা, প্রকাশ মাধ্যম বাংলা সাহিত্য।

'জিজ্ঞাসা' গ্রন্থভুক্ত প্রবন্ধগুলির মধ্যে খাঁটি বিজ্ঞান বিষয়ক প্রবন্ধের সংখ্যা চার- মাধ্যাকর্ষণ, বর্ণ-তত্ত্ব, উত্তাপের অপচয় এবং নিয়মের রাজত্ব। 'মাধ্যাকর্ষণ' প্রবন্ধ মধ্যে লেখক কোপার্নিকাস থেকে শুরু করে কেপলার, দেকার্ত, নিউটন প্রমুখ বৈজ্ঞানিকগণের ব্যাখ্যা অনুসারে বিভিন্ন উদাহরণযোগে পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ শক্তি সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। উক্ত সকলেই তাঁদের ভাষায় ব্যাখ্যা করেছেন মাধ্যাকর্ষণ শক্তির অস্তিত্ব নিয়ে। কোপার্নিকাসের ব্যাখ্যা লেখক সাহিত্যের ভাষায় উপস্থাপন করেছেন। সূর্য স্থির। মাধ্যাকর্ষণ শক্তির দ্বারা পৃথিবীসহ অন্যান্য গ্রহগুলি যেমন সূর্যের চারিদিকে ঘুরছে, তেমন অন্য অন্য উপগ্রহগুলিও গ্রহের চারদিকে ঘুরছে কলুর চোখ ঢাকা বলদের মত সুনির্দিষ্ট পথে নিয়ম মেনে। কোপার্নিকাসের কথাকে মেনে নিয়ে কেপলার গ্রহদের গতিবিধি বিষয়ে তাদের বৃত্তাভাস বা অপবৃত্ত পথের কথা বলেছেন। অর্থাৎ একটা গোলাকৃতির আংটিকে দুপাশ থেকে চাপ দিলে যেমন হয়, জ্যামিতিক ভাষায় তাকে বৃত্তাভাস বা অপবৃত্ত বলে। গ্রহগণ এমন একটা পথে সূর্যকে কেন্দ্রে রেখে আবর্তিত হয়। আর সূর্য থেকে দূরত্ব ভেদে তাদের গতির হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটে। যে গ্রহের দূরত্ব যত বেশি, সূর্য প্রদক্ষিণের সময়সীমা তার তত বেশি এবং আকর্ষণ-বলের পরিমাণ দূরত্বের বর্গানুসারে তত অল্প। এখন লেখকের জিজ্ঞাসু মনের প্রশ্ন- এই গ্রহগুলি নিয়ম মেনে ঘোরে কেন? সাহিত্যিক হয়ে তিনি তার উত্তর অন্বেষণ করেছেন এবং সাহিত্যের ভঙ্গিতে সরস ভাষায় বলেছেন-

> "উহারা ঘুরে উহাদের মর্জি; উহারা বড় লোক ও ভাল লোক, উহারা কি আর অসংযতভাবে অনিয়মে ঘুরিতে পারে? অথবা এক একটা গ্রহ এক একটা দেবতার বাহন; দেবতারা কি একটা মতলব আঁটিয়া ঐরূপ খেলা খেলিতেছেন।"[১]

সৃষ্টির সূচনা থেকেই গ্রহগুলি অনবরত তাদের স্থান পরিবর্তন করে চলেছে। বিজ্ঞানের এই নিরস বিষয়ের মধ্যেও লেখক নির্মল হাস্যরসের উদ্রেক করেছেন। বিজ্ঞানের ভাষায় গ্রহগুলি নির্দিষ্ট নিয়মাধীন হলেও তাদের এই ভ্রমণ সম্পর্কে সাহিত্যের রসসিক্ত ভাষায় লেখক বলেছেন—

> "এই গ্রহগুলি নিতান্ত অকারণে পৃথিবী প্রদক্ষিণ করিয়া বেড়াইতেছে, হয়ত এইরূপ নির্দেশ উচিত হইল না। গ্রহগণের এইরূপ ভ্রমণের উদ্দেশ্য কেহ কেহ আবিষ্কার করিয়াছেন। তোমার জন্মকালে বৃহস্পতি যখন কর্কটরাশিস্থ ছিলেন, তখন তুমি পঁয়ত্রিশটি বিবাহ করিতে বাধ্য, ইহা অনেক ভদ্রলোকে অদ্যাপি পুরা সাহসে বলিয়া থাকেন। গ্রহগণের অবস্থান মনুষ্যের শুভাশুভ নির্দেশ করে; ইহাতে যে সন্দেহ করে, সে নির্বোধ; কেন না, চন্দ্রের অবস্থানভেদে জোয়ার-ভাটা কি প্রত্যক্ষ ঘটনা নহে? আর ঐরূপ একটা উদ্দেশ্য না থাকিলে বিধাতা কি এতই কাণ্ডজ্ঞানহীন যে, এতগুলি প্রকাণ্ড জড়পিণ্ডকে অনর্থক ঘুরিয়া মরিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন?"[২]

আসলে সৌরজগৎস্থিত সমস্ত কিছুই এক অদৃশ্য শক্তির দ্বারা এক অলিখিত নিয়মের বশীভূত। নিউটন যে আপেল-ফল পতনের কারণ নির্দ্দেশ করে গেছেন তাতে প্রমাণিত, আপেল-ফল জগতে যে নিয়মে চলে, গ্রহ উপগ্রহ থেকে ধূমকেতু উল্কাপিণ্ড পর্যন্ত সেই নিয়মেই চলে।

এই মাধ্যাকর্ষণ শক্তিই হলো প্রাকৃতিক নিয়মের আধার। যার আকর্ষণে পার্থিব দ্রব্য সকল কেন্দ্রের অভিমুখে পতিত হয় তেমনি অপার্থিব দ্রব্যও সূর্যের আকর্ষণকে অগ্রাহ্য করতে না পেরে তার চারিদিকে ধাবমান হয়। এখন প্রশ্ন, আপেল নিচে নামে, কিন্তু বেলুন উপরে উঠে যায় কেন? এই অনিয়মের মধ্যেও লেখক নিয়মের ব্যাখ্যা করেছেন। পৃথিবী যেমন সকল দ্রব্যকে মাধ্যাকর্ষণ শক্তির দ্বারা নিজের কেন্দ্রে আনতে চায়, তেমনি তরল বা বায়বীয় পদার্থ মাত্রই দ্রব্যকে উপরে তুলতে চায়। এর নাম চাপ। তাই বেলুন উপরে উঠে যায়। অর্থাৎ মাধ্যাকর্ষণ শক্তি বস্তুকে নিচে নামায়, আর চাপ ওপরে ওঠায়। যেখানে চাপের তুলনায় আকর্ষণ বেশী দ্রব্য তখন নিচে নামে এবং বিপরীত ক্রিয়ায় ওপরে উঠে যায়। আর উভয়েই যখন সমান থাকে দ্রব্য সেখানে 'ন যযৌ ন তস্থৌ'। আবার যেখানে নিউটনের সূত্র চলে না সেখানে অন্য নিয়ম চলে, সেখানে সেটাই নিয়ম। অর্থাৎ 'সর্বত্রই নিয়মের বন্ধন- জগৎ নিয়মের রাজ্য'।

'উত্তাপের অপচয়' প্রবন্ধের মূল বিষয় হলো- পঞ্চভূতের অন্যতম 'তেজ'-এর অপচয় কমিয়ে মহাপ্রলয় সম্পর্কে বিশ্ববাসীকে সচেতনতার বার্তা দেওয়া। এই তেজের উৎস হলো সূর্য। সূর্য থেকে যে পরিমাণ তাপ পৃথিবীতে পতিত হয় তার কিয়দংশ পরিমাণ কাজে লাগে মাত্র। আর তাতেই জগত সংসার সচল থাকে। বাকি অংশের অপচয় ঘটে। সূর্য থেকে যে তাপ পাওয়া যায় তার দ্বারা জগত সংসারের কাজ ঠিকমতোই চলে যায়। কিন্তু মনুষ্য জাতির তাতে নিবৃত্তি নেই। সে আরো চায়। পৃথিবীরে এপ্রান্ত-ওপ্রান্ত খুঁজে ভূ-গর্ভস্থ সম্পত্তি সকল খুঁজে এনে রাত্রির শীতলতা দূর করতে অগ্রসর হয়েছে মানবজাতি। তাপের ধর্ম সম্পর্কে লেখক বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যায় বলেছেন যে, জল যেমন স্বভাবতই নিম্নপ্রবণ তাপ তেমনি শৈত্যপ্রবণ হয়ে থাকে। অর্থাৎ তাপের গতি উষ্ণ স্থান থেকে শীতলস্থানে প্রবাহিত হয়। এর বিপরীত নিয়মের বিরুদ্ধ। প্রকৃতির নিয়ম অনুসারে সূর্য থেকে তাপ শীতল পৃথিবীতে পতিত হয়ে প্রকৃতির ভারসাম্য বজায় রাখে রাত্রিকালীন সময়ে শীতল অন্ধকারে। কিন্তু মানব জাতির প্রয়োজনার্থে রাত্রির অন্ধকার দূর করতে আলোর প্রয়োজনে যে পরিমাণ শক্তি ব্যয় দরকার, আকাশ তরঙ্গের দ্বারাই সেই প্রয়োজন সাধিত হতে পারে। কিন্তু আমরা তেল বাতি গ্যাস কয়লা পুড়িয়ে তাপের সহস্র গুণ অপচয় করি। তাপের এই অপচয় বিষয়টিকে লেখক উপমার প্রয়োগে সাহিত্য গুণান্বিত করে তুলেছেন—

> "আচমনে এক গণ্ডুষ জল আবশ্যক; আমরা হিমালয় হইতে খাল কাটিয়া গঙ্গা আনিয়া গৃহদ্বারে উপস্থিত করি, এবং তজ্জন্য একটা রাজ্যের তহবিল অপব্যয় করি। বিশল্যকরণীর একটা শিকড়ের জন্য আমরা প্রকাণ্ড গন্ধমাদনকে স্কন্ধে করিয়া সমুদ্র লঙ্ঘনের আয়োজন করি। প্রকৃত পক্ষে ইহা প্রহসন;"[৩]

প্রকৃতির এই কৃত্রিম উষ্ণায়ন রুদ্ধ হলে তবেই মহাপ্রলয় বিলম্বিত হবে মাত্র।

'বর্ণ-তত্ত্ব' হলো প্রকৃতিতে সৌন্দর্য সৃষ্টিকারী রংয়ের উৎপত্তি বিষয়ক বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ। আমরা জানি, ঈথর নামক দিগন্ত প্রসারিত পদার্থে কম্পনের ফলে যে তরঙ্গ সৃষ্টি হয় তার দ্বারা আলোর উৎপত্তি। সেই তরঙ্গের দৈর্ঘ্য ভেদে আলো থেকে নানা রঙের অনুভূতি গ্রহণ করে চোখ। সূর্যের আলো সাধারণত সাদা। আকাশের পথ ধরে সেখানে নানা হিল্লোলের সঞ্চার ঘটে এবং রঙের সৃজন হয়। রঙ সাধারণত সাত প্রকার। নির্দিষ্ট পরিমাপ দৈর্ঘ্যের কম বা বেশি হলে সেই রং বা আলো আর আমাদের দৃষ্টিগোচর হয় না। তখন কেবল তা অন্ধকার বলেই প্রতীত হয়। আমাদের দৈনন্দিন জীবনযাত্রায় রঙের এই বর্ণবৈচিত্র সজীব প্রফুল্লতা দান করে।

বিজ্ঞানে-দর্শন বিষয়ক প্রবন্ধগুলির মধ্যে অন্যতম হলো 'সৌন্দর্য-তত্ত্ব' ও 'সৌন্দর্যবুদ্ধি' রচনা দুটি। প্রবন্ধ দুটির আলোচ্য বিষয় হলো মানুষের সৌন্দর্যবোধ। প্রথম প্রবন্ধে বৈজ্ঞানিক এবং দ্বিতীয়টিতে দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গি প্রাধান্য লাভ করেছে। প্রবন্ধ দুটির প্রকাশকাল যথাক্রমে সাধনা পত্রিকায় ১৩০০ ভাদ্র ও প্রদীপ পত্রিকায় ১৩০৭

মাঘ সংখ্যায়। লেখক এই দুই প্রবন্ধের মধ্যে বিভিন্ন সাহিত্যের নানা অনুষঙ্গ উত্থাপন করে মনের সূক্ষ্ম সৌন্দর্যানুভূতির দার্শনিক তত্ত্বটিকে পরিস্ফুট করেছেন। সৌন্দর্যবোধ মানব-মনের একটি অবিচ্ছেদ্য ভাব প্রবণতা। বলা চলে সৌন্দর্য উপভোগের ক্ষমতা মানবজীবনে অন্যান্য প্রবৃত্তির মতই অন্যতম। প্রকৃতিতে জীব মাত্রেই সৌন্দর্য পিয়াসী। তন্মধ্যে মনুষ্য জীবের এই অনুভূতি প্রবল। মানুষ সুখ সন্ধানীর আর জীবন দুঃখময়। তাই সুখের এত প্রাধান্য। দুঃখময় পথের মধ্য দিয়ে মানুষ সুখের সন্ধান করে বলেই দুঃখ এত সুন্দর আর সুখ এত আকর্ষণীয়। প্রকৃতিতে কেবল সুখ বা কেবল দুঃখ থাকলে তার মধ্যে কোন সৌন্দর্য থাকতো না। তাই মানুষের সুখ-দুঃখ অনুভূতির মধ্যে সৌন্দর্যবোধের উপস্থিতি। মোটের উপর যা আমাদের মনে আনন্দ, তৃপ্তি বা সুখের অনুভূতি জাগ্রত করে তা সুন্দর এবং যার দ্বারা মনে দুঃখ, ক্লেশ, ঘৃণার উদ্রেক হয় তাই অসুন্দর বা কুৎসিত। উভয়ের উপস্থিতির জন্যই সৌন্দর্য আরাধ্য আর মানুষ সুন্দরের উপাসক। মনোবিজ্ঞানের ভাষায় বলা যায়— 'যেখানে অনুভূতি নিত্য পরিবর্তনশীল, সেইখানেই চৈতন্য স্ফূর্তিমান'। অর্থাৎ চৈতন্যের সঙ্গে অনুভূতির অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক। সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্না, ভয়-ক্লেশ প্রভৃতি অনুভূতি ভেদে চৈতন্যের পার্থক্য ঘটে। যেখানে অনুভূতির বৈচিত্র্যের প্রকাশ সেখানে চৈতন্যের সম্যক বিকাশ— সেখানেই রূপ এবং সেখানেই প্রকৃত সৌন্দর্য। আবার ডারউইনের 'প্রাকৃতিক নির্বাচন' তত্ত্বের স্বপক্ষে বলা যায়, যা জীবনধারণের সহায়ক বা উপযোগী তাই প্রকৃতি কর্তৃক নির্বাচিত হয়ে অভিব্যক্ত ও পরিস্ফুট হয়। প্রজাপতি যেমন ফুলের সৌন্দর্যে আকৃষ্ট হয়, ফলে উদ্ভিদের বংশবৃদ্ধি ঘটে। তেমন সিংহের কেশর, পাখির কলতান, ময়ূরের পুচ্ছ থেকে মানবজাতি পর্যন্ত সর্বত্রই প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের অভিব্যক্ত ভাব প্রকাশ পায়। সুতরাং বলা যেতে পারে, প্রাকৃতিক নির্বাচন হলো এই সৌন্দর্যবোধের জনক ও বিকাশক। আসলে বিশুদ্ধ সৌন্দর্য কেবল উপভোগের সামগ্রী– আর এর ফল বিশুদ্ধ নির্মল আনন্দ।

এ তো গেল দর্শন ও বিজ্ঞানের তত্ত্ব। সাহিত্যের মাধ্যমেও লেখক সৌন্দর্যবোধের তত্ত্বটিকে পরিবেশন করতে প্রয়াসী হয়েছেন। আমরা পূর্বে জেনেছি দুঃখ সুন্দর। কেননা দুঃখ আছে বলেই সুখের এত প্রাধান্য। জীবনের তিন ভাগের একের অর্ধাংশ মাত্র সুখের পরিমাণ। অতএব জীবন দুঃখময়। ক্রৌঞ্চ-মিথুন দ্বয়ের একটি শরাহত হওয়ায় যে শ্লোক স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে উচ্চারিত হয়েছে বাল্মিকীর কণ্ঠে তা থেকে সৃষ্টি হয় রামায়ণী গাথার। সেখানে রামের সীতা নির্বাসন আমরা মেনে নিতে পারি না। কারণ তা আমাদের মনে দুঃখের ভাব জাগ্রত করে এবং এই ভাব মনের কোণে এক সূক্ষ্ম সৌন্দর্যের বাতাবরণও তৈরি করে দেয়- যা মানুষের সহজাত রহস্যময় প্রবৃত্তি। প্রাবন্ধিকের এই 'সৌন্দর্য-তত্ত্ব' অনুধাবনে সাহিত্যের বিভিন্ন শাখার প্রভাব পড়েছে। কালিদাসের শকুন্তলা কিংবা বঙ্কিমের কৃষ্ণকান্ত বা শেক্সপিয়ারের লীয়র প্রভৃতি প্রসঙ্গ উত্থাপন করে সৌন্দর্য-তত্ত্ব বিষয়ে লেখক সাহিত্যিক ভাষা প্রয়োগ করে বলেছেন-

> "সৌন্দর্য্য-বোধ মানব-জীবনের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে বিজড়িত। সৌন্দর্য্য উপভোগের ক্ষমতা মানবজীবনের প্রধান সম্পত্তি। কেবল যে কবি-নামধেয় মনুষ্যবিশেষই সৌন্দর্য্যমধুর অন্বেষণে ভ্রমরবৃত্তি হইয়া জীবনপাত করিতেছে, তাহা বলা চলে না। কেন না, জগৎ হইতে তাহার সৌন্দর্য্যটুকু কোনরূপে হরণ করিতে পারিলে সম্পূর্ণ কাব্যরসবর্জ্জিত বিষয়ী লোকদিগের জন্যও দড়ি-কলসী সংগ্রহ করা দুঃসাধ্য হইয়া উঠে। সাংসারিক নিত্যনৈমিত্তিক সুখদুঃখের সহিত সৌন্দর্য্যতৃষ্ণার এমন প্রগাঢ় সম্পর্ক যে, বোধ করি, মনুষ্য মাত্রেরই জীবনকাহিনী বিশ্লেষণ করিলে সেই তৃষ্ণার সফলতার বা নিষ্ফলতার পরিচয় পাওয়া যায়। মনুষ্য মাত্রেরই জীবনকালে এমন একটি মুহূর্ত্ত আইসে, যখন সে সুদূর বনপ্রদেশ হইতে সায়ংকালীন বংশীধ্বনি কর্ণাগত করিয়া চন্দ্রাপীড়ের ঘোড়ার মত সেই অনির্দ্দিষ্ট লক্ষ্যের প্রতি দিগ্বিদিক্ ছুটিতে থাকে, এবং

> হয়ত শেষ পর্য্যন্ত তাহার উদ্ভ্রান্ত জীবন চরম লক্ষ্যের ঠাহর না পাইয়া নিয়তিবশে কোনরূপ অচ্ছোদ সরোবরের সলিলতলে সমাধি লাভ করে।"[৪]

মূলত এই সৌন্দর্যবোধের শক্তি মনুষ্য ভেদে ভিন্ন হয়ে থাকে। কবিদের মধ্যে তা বিশেষভাবে পরিস্ফুট হয়। তাদের এই সাধনা সমাজে জীবিকা অর্জনের জন্য অনুকূল না হলেও তা যেহেতু মনে আনন্দ, ভালো লাগার সঞ্চার করে সেহেতু তাদের সৃষ্টি সৌন্দর্যময়।

জগত সৃষ্টির রহস্য বিষয়ে প্রাবন্ধিক 'সৃষ্টি' প্রবন্ধের শুরুতে একটি কথকতাংশ স্মরণ করেছেন-

> "আফ্রিকা-নিবাসী কোন অসভ্য জাতির মধ্যে অদ্ভুত সৃষ্টিতত্ত্ব প্রচলিত আছে। চাঁদ ও ব্যাঙের মধ্যে বিতণ্ডা উপস্থিত হইয়া জগতের সৃষ্টি-ঘটনাটা সমাহিত হইয়া যায়; তবে উভয়ের বিরোধের ফলে সৃষ্ট জগৎটা সর্ব্বাঙ্গ সম্পূর্ণ হইতে পারে নাই। বিবাদ হইল চাঁদে ও ব্যাঙে; তাহার ফলভাগী হইল মানুষে; আধি-ব্যাধি জরামরণ আসিয়া জগৎ অধিকার করিল।"[৫]

আফ্রিকার একটি নির্দিষ্ট অঞ্চলে প্রচলিত এই গল্পটিকে সর্বগ্রহণযোগ্য করতে লেখক চাঁদ ও ব্যাঙের স্থানে ঈশ্বর ও শয়তানকে প্রতিস্থাপন করেছেন। ঈশ্বর হলেন এই সৃষ্টির স্রষ্টা। তিনি সর্বব্যাপী ও সর্বশক্তিময় তাই জগত এত বিশাল। ঈশ্বর ন্যায়ের বিধাতা তাই জগতে পুণ্যের জয়। আর শয়তানের কারসাজিতে যে সুন্দরের মধ্যে অসুন্দরের, সুখের মধ্যে দুঃখের, পুণ্যের মধ্যে পাপের বাস তাও ঈশ্বরের ইচ্ছাধীন। সুতরাং এই জগত নামক যন্ত্রের চালক হলেন সর্বময় ঈশ্বর এবং তার ইচ্ছায় হল শক্তি— তাতেই জগতের উৎপত্তি ও সুশৃঙ্খল টিকে থাকা।

বিজ্ঞানের মতে জগৎ নির্মিত হয়েছে ঈথর ও পরমাণুর মিশ্রণে। জগতের সৃষ্টি-স্থিতি-লয় বিষয়ে প্রশ্ন করলে বিজ্ঞান তার উত্তর দিতে সক্ষম। কিন্তু দর্শনের মতে জগত ও ঈশ্বর অভিন্ন, জগৎ ছাড়া ঈশ্বর অস্তিত্বহীন। আবার 'আমি' ব্যতীত জগত অস্তিত্বহীন। আমা হতেই এই জগৎ ও জগৎ-নিয়মের প্রতষ্ঠা। এর ফলেই আমার চেতনার বিকাশ ঘটে ও জ্ঞান প্রসারতা লাভ করে। সর্বত্র যে জয়লাভ হবে তা নিশ্চিত নয়। তবে এই নিয়ম প্রতিষ্ঠার সফলতা ধরেই আমার আত্মবিকাশের পরিমাণ নির্ধারিত হবে এবং এই আত্মবিকাশের নামই হলো বিজ্ঞানচর্চা - যার ফলে জ্ঞানের উন্নতি ও বিকাশ সম্ভবে। এই আত্মবিকাশের সাথে জগতের পরিধি বাড়ে, মুছে যায় দেশ ও কালের সীমারেখা।

দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে প্রাবন্ধিক আরো বলেছেন যে, জগত যেমন অনাদি নয়, কালও তেমন অনন্ত নয়। যখন যতটুকু আমি দেখছি তখন কেবল সেইটুকুরই অস্তিত্ব বর্তমান এবং সেটাই তখন আমার কাছে পরম সত্য। লেখকের কথায়—

> "অনাদি অনন্ত এই সকল দীর্ঘ বিশেষণ কবিকল্পনা, বাক্যালঙ্কার; উহা কাব্যে শোভা পায়; বিজ্ঞানে উহাদের অস্তিত্ব নাই।"[৬]

সুতরাং দেখা যাচ্ছে একটি বিষয়কে প্রতিস্থাপিত করতে লেখক সাহিত্য-দর্শন-বিজ্ঞানের মধ্যে সমন্বয় সাধন করেছেন।

'অমঙ্গলের উৎপত্তি' প্রবন্ধে ডারউইনের অভিব্যক্তিবাদের আশ্রয়ে লেখক বলতে চেয়েছেন যে, পরম করুনাময় ঈশ্বর-সৃষ্ট জগতে যে ভয়াবহ জীবন সংগ্রাম চলছে, সবলের অত্যাচার, দুর্বলের নিগ্রহ, সর্বোপরি মৃত্যু পরিলক্ষিত হয়, আপাতদৃষ্টিতে তা অমঙ্গল বলে প্রতীত হলেও এর মূলে মঙ্গলই রয়েছে। কেননা দুঃখ না থাকলে যেমন সুখ উপলব্ধি করা যায় না, মৃত্যু না ঘটলে যেমন জন্ম উদযাপন করা যায় না, তেমনি অমঙ্গল ঘটে বলে মঙ্গলের এত জয়জয়কার। জীবনের সঙ্গে জন্ম-মৃত্যু, সুখ-দুঃখ, মঙ্গল-অমঙ্গলের নিত্যসমন্ধ। এগুলি

ব্যতীত জীবন জড়ত্ব বিশেষ। আবার জীবন ছাড়াও এসব চেতনা অনস্তিত্ব। যতদিন চেতনার জাগ্রতবস্থা স্ফূর্তি পাবে ততদিন মঙ্গলের সাথে অমঙ্গলের সহাবস্থান। তাই প্রবন্ধের শেষে প্রাবন্ধিক অমঙ্গলেরই জয়গান গেয়েছেন।

রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর 'জিজ্ঞাসা' প্রবন্ধগ্রন্থের অন্তর্গত দর্শনে-বিজ্ঞান রচনাগুলির মধ্যে অন্যতম হলো 'মায়া-পুরী' এবং 'বিজ্ঞানে পুতুলপূজা'। এর মধ্যে 'মায়া-পুরী' রচনাটি ১৯১১ সালে প্রথম প্রকাশিত হয় সাহিত্য পত্রিকায় এবং পরে ১৯১৪ সালে 'জিজ্ঞাসা' গ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণে পুনর্মুদ্রিত হয়। রামেন্দ্রসুন্দরের সমগ্র বিজ্ঞান দর্শনের স্বরূপ এই প্রবন্ধ মধ্যে উৎঘাটিত হয়েছে। মায়াপুরী অর্থে লেখক বিশ্ব-জগতকে বুঝিয়েছেন। কিন্তু 'আমি' ব্যতীত, 'আমার খেয়াল বা চেতনা' ব্যতীত এই জগতের কোন অস্তিত্ব নেই। জীবের চেতনা থেকেই জগৎ উৎপন্ন। এই বিশ্বজগৎ একটা প্রকাণ্ড অংশ আর চেতনা সম্বলিত জীবদেহ তার তুলনায় নিতান্ত ক্ষুদ্র একটি অংশ মাত্র। এই জগতই হচ্ছে জীবের একমাত্র শত্রু ও একমাত্র মিত্র। কেননা বাহ্যজগৎ ষড়ঋতুর রুদ্রমূর্তির সাথে প্লেগ, কলেরা, ম্যালেরিয়ার মত নানা মহামারী ছাড়াও নানা জন্তু-জানোয়ারের সহস্ররূপ ধারণ করে জীব দেহকে ধ্বংস করতে তৎপর থাকে। আবার মিত্র এই কারণে যে, এই বাহ্যজগত থেকেই জীব তার দেহ ধারণের জন্য প্রয়োজনীয় মশলা সংগ্রহ করে তার দেহকে পুষ্টিত ও বর্ধিত করে গঠন করছে প্রতিনিয়ত। শুধু তাই নয় বাহ্যজগতের আক্রমণ থেকে নিজেকে রক্ষার্থে সে শক্তি ও অস্ত্র সংগ্রহ করছে এই বাহ্যজগৎ থেকেই। 'বাহ্য জগতের একমাত্র লক্ষ্য— জীবনকে লোপ করা; জীবনের এক মাত্র লক্ষ্য— আপনাকে কোন-না-কোনরূপে বাহাল রাখা'।

এই রচনার মধ্যে প্রাবন্ধিক জীবদেহকে যন্ত্রের সঙ্গে তুলনা করলেও তার জীবন প্রবাহই প্রধান বিষয়। যন্ত্র পূর্বনির্ধারিত বিষয় ছাড়া অন্য কোন কাজে সক্ষম নয়, কিন্তু জীবদেহ নতুন অবয়বে আপনাকে গড়ে নিতে পারে— তাই তো ব্যাঙাচি ব্যাঙে পরিণত হয়, মর্কট হয় মানুষ। পারিপার্শ্বিক শক্তির আঘাত ও আক্রমণে নিজেকে পরিণত ও পরিবর্তিত করার ক্ষমতা জীবদেহেই বর্তমান। জীবের সন্তানোৎপাদনের মধ্য দিয়ে তার বীজের নবজীবন আরম্ভ হয়, ফলে ব্যক্তি মৃত্যু মুখে পতিত হলেও জাতি থেকে যায়। ডারউইনের 'প্রাকৃতিক নির্বাচন' তত্ত্বের সাহায্যে বলা যায় জীব-সমাজে অবিরাম বাছাই কার্য চলছে। যে সদা পরিবর্তনশীল প্রকৃতির সঙ্গে নিজেকে পরিবর্তন করতে পারে সে টিকে যায় অন্যথা ধ্বংস বা বিলুপ্তিই তার একমাত্র আগামী। এই জীবনযুদ্ধে টিকে থাকার লড়াইয়ে জীব সতত হেয় পদার্থ বর্জন এবং উপদেয় গ্রহণ করছে। উপদেয় পদার্থ মাত্রেই জীবের কাছে সুখ প্রদানকারী। আর এটাই প্রাকৃতিক নির্বাচনের ফল। সুখ অন্বেষণ ও দুঃখের পরিহারই অবশ্য কাম্য। এই শিক্ষাই প্রকৃতির পাঠশালায় অবিরত শেখানো হয়। বুদ্ধিবৃত্তি ও বিচারশক্তির দ্বারাই মনুষ্য জীবজগতে শ্রেষ্ঠ জীব বলে প্রমাণিত হয়েছে।

বিজ্ঞান ও দর্শন ছাড়া এই প্রবন্ধের সাহিত্যগুণও বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণকারী। লেখক বিজ্ঞান দর্শনের বিষয়কে যেভাবে সাহিত্য গুণান্বিত ভাষায় প্রকাশ করেছেন তা প্রশংসার যোগ্য। এই প্রবন্ধ মধ্যে অক্ষয়কুমার দত্তের 'চারুপাঠ', বিদ্যাসাগর প্রণীত 'বোধোদয়' প্রভৃতি গ্রন্থের প্রভাব তো পড়েছেই, সেই সাথে আছে লেখকের ভাষার ওজস্বী প্রকাশভঙ্গী। তিনি এই বিশ্বজগতকে মায়াপুরী বলেছেন, আর মনুষ্য জাতিকে অন্যান্য জীবের মতো একপ্রকার জীব বলে উল্লেখ করেছেন—

> "পৃথিবীটা একটা প্রকাণ্ড চিড়িয়াখানা; এক পয়সা দর্শনী না দিয়া আমরা এই চিড়িয়াখানায় প্রবেশ করিয়াছি।"[৭]

এই ভাষা যেমন সহজ সরল, এর পরিবেশন তেমনি প্রাঞ্জল। 'মায়া-পুরী' প্রবন্ধ মধ্যে লেখক বিশ্বকে একটা পরীক্ষাগার আর মনুষ্য জাতিকে পর্যবেক্ষক বলে উল্লেখ করেছেন। সেখানে সর্বদা কিছু না কিছু এক্সপেরিমেন্ট চলছে—

"...কেহ ইন্দুরের লেজ কাটিয়া দেখিতেছেন, তাহার বাচ্চার লেজ গজায় কি না;"[৮]

-এহেন সরস বাক্যের দ্বারা লেখকের রসিক মনের পরিচয় যেমন পাওয়া যায় তেমনি প্রবন্ধ মধ্যে হাস্যরসের ফল্গুধারার অবারিত দ্বার খুলে যায়।

আর্য্যাবর্ত্ত পত্রিকায়, অগ্রহায়ণ ১৩১৭-তে প্রকাশিত 'বিজ্ঞানে পুতুলপূজা' প্রবন্ধ মধ্যে লেখক বিজ্ঞানবিদ্যার অস্পষ্টতা বিষয়ে আলোচনা করেছেন। আমরা দেবতাকে না পেয়ে কতগুলি পুতুল কল্পনা করে তার মূর্তি বানিয়ে যেমন ষোড়শোপচারে পূজার ব্যবস্থা করি, তেমনি বিজ্ঞানবিদ্যাও। এতে বিজ্ঞানের কোন দোষ নেই। এই সত্যটি উপলব্ধি করে রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী সত্যের শ্রেণীবিভাগ করেছেন- স্বতঃসিদ্ধ সত্য ও মনঃকল্পিত সত্য বলে। এমন কতগুলি সত্য আছে যা আমরা মানতে বাধ্য সেগুলি স্বতঃসিদ্ধ সত্য। 'দুই দ্রব্য প্রত্যেকে তৃতীয় দ্রব্যের সমান হলে তারা পরস্পর সমান হবে'- ইউক্লিডের শাস্ত্রে এটা স্বতঃসিদ্ধ সত্য হলেও সকল শাস্ত্র ও সকল ক্ষেত্রে তা স্বতঃসিদ্ধ সত্য নাও হতে পারে, প্রবন্ধ মধ্যে উদাহরণ প্রয়োগে রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী তা দেখিয়েছেন। এ প্রসঙ্গে লেখক স্থান ভেদে দৈর্ঘ্যের পার্থক্যের তুলনামূলক বিচারের দৃষ্টান্তও দিয়েছেন।

এরপর প্রাবন্ধিক জড়ের জড়ত্ব বিষয়ে Mass-এর বাংলা প্রতিশব্দ করেছেন 'বস্তু'। জড়ের সাধারণ ধর্মে ভার (Weight) ও বস্তু (Mass) আবশ্যিক। কিন্তু বস্তু ও ভার এক নয়, উভয়ের পার্থক্য আছে। জড় পদার্থে ভার স্বাভাবিক ধর্ম নয়, কিন্তু বস্তু জড়ের স্বাভাবিক ধর্ম। জড় পদার্থে বস্তুর পরিমাণ অল্প হলে তার ভারও অল্প হবে- এটা পরীক্ষালব্ধ সত্য, স্বতঃসিদ্ধ সত্য নয়। কেননা স্থানভেদে অর্থাৎ ভূ-পৃষ্ঠ থেকে যত উচ্চে বা নিম্নে যাওয়া যাক না কেন বস্তুর ভারের পরিবর্তন হলেও বস্তুর পরিমাণের কোন পরিবর্তন হয় না। অষ্টাদশ শতকের বিজ্ঞানশাস্ত্র জড়ের ও ঊনবিংশ শতাব্দীর বিজ্ঞানশাস্ত্র শক্তির অবিনাশিতা প্রমাণ করেছে, তার ভ্রান্তি প্রদর্শনে রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী বলেছেন যে, শক্তি নানাবিধ রূপ গ্রহণ করতে পারে কিন্তু তার পরিমাণের কখনো হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটে না। জড় পদার্থের ধাক্কা দেওয়া ও ধাক্কা খাওয়ার শক্তি দিয়ে তার জড়ত্ব বা বস্তুর পরিমাণ নিরূপণ করা হয়। তড়িতের সেই শক্তি আছে। যতক্ষণ তড়িৎ-এর কণিকাগুলি স্থির থাকে ততক্ষণ তাদের জড়ত্ব থাকে না। যখন বেগে চলে তখনই জড়ত্বের জন্ম হয় এবং বেগ যত বাড়তে থাকে জড়ত্বও তত বৃদ্ধি পায়। জড়ের এই জড়ত্ব ও শক্তি আসলে আমাদেরই মনগড়া পদার্থ মাত্র। বিশ্বজগৎ সম্পর্কে আমাদের ধারণা পঞ্চ-ইন্দ্রিয়ের উপর নির্ভরশীল। এদের সাহায্যে বিশ্বজগতের কিয়দংশমাত্র আমরা প্রত্যক্ষ করি। এই সংকীর্ণতা থেকেই আমরা জড় ও শক্তির অবিনাশিতা বিষয়ে কল্পনা করে নিই। এবং বিজ্ঞান যে বিশ্বজগতের কল্পনা করে বাস্তবের তার কোন অস্তিত্বই নেই। লেখকের মতে, 'আমি' এবং 'আমরা'ই একমাত্র এই জগতের পরমার্থরূপ অধিষ্ঠানকর্তা, এই পরমার্থ ব্যতীত বিজ্ঞান অচল, তার অস্তিত্ব জগতে নাস্তি। প্রবন্ধ শেষে লেখক বলেছেন—

> "মৎকল্পিত ও মদ্রচিত বিশ্ব-জগতের দেবালয় জুড়িয়া আমিই এক মাত্র পরমদেবতা অধিষ্ঠান করি। আমিই এই বিশ্ব-জগতের কল্পনাকর্তা এবং আমিই উহার রচনাকর্তা; ইংরেজীতে বলিলে আমিই এই বিশ্ব-জগতের ডিজাইনার ও আমিই উহার আর্কিটেক্ট। আমিই উহার 'রূপ' দিয়াছি এবং আমিই উহার 'নাম' দিয়াছি। আশ্চর্য্য এই যে, কি জানি, কি খেয়ালের বশ হইয়া আমি যেন তাহা জানি না, এইরূপ অভিনয় করি, এবং আমার বাহিরে এবং আমার উপরে আর এক জন কল্পনাকর্ত্তার ও রচনাকর্ত্তার কল্পনা করিয়া, কোথায় তিনি, কোথায় তিনি, এইরূপ জিজ্ঞাসার পণ্ড শ্রমে আমি প্রবৃত্ত হই। অথবা স্বতন্ত্র আমার, স্বাধীন আমার, মুক্ত আমার, এইরূপ পরতন্ত্রবৎ, পরাধীনবৎ, বন্ধুবৎ আচরণেই,—এই পণ্ড শ্রম স্বীকারেই, -আমার আহ্লাদ এবং এই জিজ্ঞাসাতেই আমার আনন্দ।"[৯]

'জিজ্ঞাসা' গ্রন্থভুক্ত দার্শনিক প্রবন্ধগুলি হল- 'সুখ না দুঃখ?', 'সত্য', 'অতিপ্রাকৃত- প্রথম ও দ্বিতীয় প্রস্তাব', 'কে বড়?' এবং 'পঞ্চভূত'। এই রচনাগুলির মধ্যে প্রাবন্ধিক রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর দার্শনিক মনোভাবের প্রকাশ লক্ষ্য করা যায়। 'সুখ না দুঃখ?' তার মধ্যে অন্যতম। এই প্রবন্ধে লেখক জগতে সুখ না দুঃখ- কার আধিক্য বেশি তার উত্তর দিতে গিয়ে ডারউইনের অভিব্যক্তিবাদের উল্লেখ করেছেন এবং দুঃখবাদীদের মধ্যে শোপেনহাওয়ার ও হার্টম্যানকে অগ্রবর্তী করে বলেছেন যে, জীবন সর্বাংশে দুঃখময় এবং সুখ হলো দুঃখের অভাবমাত্র। বিজ্ঞানের কাছেও এর সদুত্তর নেই। সেখানে দেখা যায় প্রকৃতি নিষ্ঠুর। সে তার উদ্দেশ্য সাধনের জন্য অত্যন্ত নিষ্ঠুরভাবে মানবজীবনকে ধ্বংস করতেও ভাবিত হয় না। কেননা ব্যক্তিগত বৃদ্ধি নয় জাতীয় জীবনের বৃদ্ধিই প্রকৃতির উদ্দেশ্য। আবার সাহিত্যকে লেখক কবিজীবনের প্রতিবিম্বরূপে দেখে বলেছেন যে, কালিদাস অনন্ত সুখ ও সৌন্দর্যের অধিকারী ছিলেন; শেক্সপিয়রের রচনায় পরীরাজ্যের চঞ্চলতা থেকে ইংরেজের জাতীয় জীবনের চঞ্চলতা অনুভব করা যায়; বন্ধুশোকার্ত টেনিসন প্রকৃতির উদ্দেশ্য অনুধাবন করতে না পেরে দুঃখসাগরে নিমজ্জিত হয়েছেন; যেমন হয়েছে বঙ্কিমচন্দ্রের কুন্দনন্দিনী। মানবজীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ দুঃখ-সঙ্গীত হলো 'রামায়ণ'। অতএব জীবনে দুঃখ থাকবে কিন্তু তাই ব'লে বৈরাগ্য সাধন প্রকৃতির উপদেশ নয়।

'সত্য' প্রবন্ধে দর্শন ও বিজ্ঞানের সমন্বয়ে ঘটেছে। হর্বর্ট স্পেন্সর সত্যের একটি সংজ্ঞা দিয়ে বলেছেন যে, আমরা যার বিকল্প কল্পনা করতে পারি না তাই সত্য। প্রকৃতির নিয়মানুবর্তিতা সত্য। কিন্তু প্রকৃতি চিরকাল যে নিয়মে চলেছে, আগামীতেও যে সেই নিয়মে চলবে তার নিশ্চয়তা নেই। তবে নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটলেও প্রকৃতি অন্য এক নিয়মের অধীন হবে এই মাত্র বলা যায়। ভূয়োদর্শনও এই একই কথা বলেছে- আজ যা নিয়ম কাল তা অনিয়ম হতেই পারে। এই ভাবনার অনুরূপ প্রকাশ লক্ষিত হয় 'অতিপ্রাকৃত- প্রথম ও দ্বিতীয় প্রস্তাব' রচনাদ্বয়ের মধ্যে। রচনা দুটি দশ বছরের ব্যবধানে প্রকাশিত হয় সাধনা ও বঙ্গদর্শন পত্রিকায়। রচনা দুটির মধ্যে লেখক প্রাকৃত নিয়মের যা বিরুদ্ধ সেই অতিপ্রাকৃত বিষয়ের মূল অনুসন্ধানে তৎপর হয়েছেন। যা প্রকৃতি নির্দিষ্ট ও প্রকৃতির নিয়মসঙ্গত তা প্রাকৃত এবং প্রকৃতির নিয়মের বাইরে যা কিছু ঘটমান তাই হল অতিপ্রাকৃত। লেখক প্রথম প্রস্তাবে বলেছেন যে, অতিপ্রাকৃতে বিশ্বাস মানুষের পক্ষে স্বাভাবিক, কিন্তু জ্ঞানের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে মানুষের সেই বিশ্বাস কমে আসছে। অনভিজ্ঞতার কারণে কোন সত্য ঘটনাও অলীক বলে প্রতীত হলেও তা সর্বাংশে প্রকৃতির নিয়ম ছাড়া নয়। বিশ্বব্যাপী যা কিছু ঘটমান তার সবই প্রকৃতির নিয়মাধীন অর্থাৎ প্রাকৃত। হিউম, টিণ্ডাল প্রমুখ দার্শনিকগণের মতে, জগতে অতিপ্রাকৃত বা মিরাকলের কোন স্থান নেই। প্রাবন্ধিক রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী বলেছেন—

> "অতিপ্রাকৃত ঘটনা অর্থশূন্য প্রলাপবাক্য। উহা বন্ধ্যাপুত্রের ন্যায় নিরর্থক শব্দ।" [১০]

'কে বড়?' প্রশ্নের উত্তর অন্বেষণে প্রাবন্ধিক প্রথমে বিজ্ঞানের পরে দর্শনের কাছে উত্তর খুঁজেছেন। মানুষ সর্বশ্রেষ্ঠ জীব কি না তার মীমাংসার্থে লেখক বিজ্ঞানের দ্বারস্থ হয়ে ডারউইন ও লাপ্লাসের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যার উল্লেখ করেছেন। প্রাকৃতিক নির্বাচনের তত্ত্বানুযায়ী মানুষের উপকারে আসে না এমন কোন বস্তু বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে নেই। কিছুকাল পরেই আবার বিজ্ঞান জানায় যে, এই বিরাট বিশ্বজগতের কাছে মানুষ অতি ক্ষুদ্র কীট তুল্য বালুকণা বিশেষ। এই উত্তর মনোঃপূত না হওয়ায় লেখক দার্শনিক মীমাংসার পথ অবলম্বন করে জানেন, জগৎ অসীম নয়, কালও অনন্ত নয়—

> "মানুষে কাল্পনিক অনন্তের ও কাল্পনিক অনাদির সৃষ্টি করিয়া আপনার সম্মুখে ধরিয়া তাহার কাল্পনিক বৃহত্ত্বের তুলনায় আপনাকে ক্ষুদ্র মনে করিয়া প্রতারিত হয়।"[১১]

দার্শনিক তত্ত্বের ব্যাখ্যায় লেখক বলেছেন যে, মানুষের অন্তরেই জগতের বাস। মানুষই এই জগতের স্রষ্টা ও নিয়ন্তা। সে তার অন্তরের জগতকে বাইরে প্রক্ষেপ করেই এই বিশাল কাল্পনিক জগতের সৃষ্টি করেছে। আর মানুষের জ্ঞানের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে সেই জগতের পরিধিও বিস্তৃততর হয়ে চলেছে।

আশ্বিন-কার্তিক ১৩০৫ বঙ্গাব্দে পুণ্য পত্রিকায় প্রকাশিত 'পঞ্চভূত' নামক দার্শনিক প্রবন্ধে দর্শনের পাশাপাশি বৈজ্ঞানিক মতবাদ আলোচিত হয়েছে। দার্শনিক মতে, পঞ্চভূত অর্থাৎ পাঁচটি ভূতের (ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ, ব্যোম) সমন্বয়ে জগৎ নির্মিত। ভূত শব্দের ইংরেজি প্রতিশব্দ হলো এলিমেন্ট। আবার বৈজ্ঞানিক মতে, জগৎ আশিটি এলিমেন্টের দ্বারা নির্মিত (ভবিষ্যতে সংখ্যাটি বাড়তে পারে)। এই বিষয়ে দর্শন ও বিজ্ঞান-উভয়ের মধ্যে কোন বিরোধ নেই; কেবল তাদের প্রণালী, পথ ও ভাষা স্বতন্ত্র মাত্র। তারা উভয়েই জগতকে বিশ্লেষণ করে জগতের মূল উপাদানগুলি নির্ণয়ের চেষ্টা করে। একজনের অন্বেষণ পদ্ধতির নাম মনোবিজ্ঞান, অন্যজনের জড়বিজ্ঞান।

শুধু বিজ্ঞান-দর্শন নয়, এ দেশীয় দার্শনিকদের মতো গ্রীক দার্শনিকেরাও ভৌতিক পদার্থের বিশ্লেষণে পঞ্চভূতের অস্তিত্ব স্বীকার করেছেন। আবার জগৎ বিশ্লেষণে দর্শনের দুটি শাখা সাংখ্য ও বেদান্তের বিশ্লেষণ প্রণালীও প্রায় একই রকম। উভয়েই পঞ্চভূতের (রূপ, রস, গন্ধ, শব্দ, স্পর্শ) সমন্বয়ে জগতকে বিশ্লেষণ করেছেন। তা সত্ত্বেও উভয়ের মধ্যে সূক্ষ্ম প্রভেদ বিদ্যমান। যেমন সাংখ্য দর্শনের মহাভূত এবং বেদান্ত দর্শনের সূক্ষ্মভূত ও স্থূল ভূত মনঃকল্পিত বিষয়, বাস্তবে যার কোন অস্তিত্ব নেই। সাংখ্য মতে পাঁচটি মহাভূতের (ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ, ব্যোম) মধ্যে ক্ষিতি হলো শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ এই পঞ্চভূতের সমষ্টি। অপ অর্থাৎ জলে বর্ণ ব্যতীত চারটি গুণ বিদ্যমান। তেজ তিনগুণের সমষ্টি যথা- শব্দ, স্পর্শ ও বর্ণ। মরুৎ অর্থাৎ বায়ুতে কেবল শব্দবহন শক্তি ও স্পর্শজনন শক্তি আছে। ব্যোম বা আকাশের কেবল আছে শব্দগুণ। এই পঞ্চভূতের অন্বয়ে এক-একটি মহাভূত এবং পঞ্চ মহাভুতের সমন্বয়ে ভৌতিক পদার্থরূপ জগৎ নির্মিত হয়েছে। অন্যদিকে বেদান্তের পরিভাষায় ভূত দ্বিবিধ- সূক্ষ্ম ভূত ও স্থূলভূত— যাদের একটি ব্যতীত অন্য কোন গুণ নেই। যেমন আকাশের কেবল শব্দগুণ, বাতাসের স্পর্শগুণ, জলের রস, তেজের রূপ ব্যতীত অন্য কোন গুণ নেই। এই পাঁচটি সূক্ষ্ম ভূত বিভিন্ন মাত্রায় যুক্ত করলে নির্মিত হয় স্থূল ভূত। বেদান্তের পরিভাষা অনুসারে, প্রত্যেক সূক্ষ্ম ভূতের চার ভাগে অন্য চারটি সূক্ষ্ম ভূতের প্রত্যেকের এক ভাগ করে যোগ করলে স্থূলভূত হয়। অর্থাৎ স্থূল ভূতের ষোল আনা বিশ্লেষণ করলে একটা সূক্ষ্ম ভূতের আট আনা এবং অন্য চারটা সূক্ষ্ম ভূতের প্রত্যেকটি দু আনা করে বিদ্যমান থাকে— প্রত্যেক স্থূল ভূতেই রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, শব্দ- এই পাঁচ গুণ বিদ্যমান; একটা প্রবল, বাকিগুলো দুর্বল। এইভাবে পাঁচ গুণ মিশিয়ে বা পঞ্চ সূক্ষ্মভূত সমন্বয়ে স্থূল ভূত নির্মাণকে 'পঞ্চীকরণ' বলা হয়। মোটকথা সাংখ্য ও বেদান্ত— উভয়ের জগত ব্যাপার বিশ্লেষণের পরিভাষা কিঞ্চিৎ ভিন্ন হলেও রীতি ও মত এক ধরনের। উভয়েই বাহ্য জড়জগৎকে পঞ্চভূতের দ্বারা বিশ্লেষণ করেছেন এবং সাংখ্যের মহাভূত ও বেদান্তের স্থূলভূত— 'উভয়ই তন্মাত্রের সমষ্টি মাত্র'। আবার বৈজ্ঞানিকের এলিমেন্ট ও দার্শনিকের ভূত— উভয় শব্দের অর্থ এক হলেও, তাৎপর্য ও বিশ্লেষণ পদ্ধতি কিন্তু এক নয়।

পরিশেষে রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর 'জিজ্ঞাসা' পর্যালোচনা করে স্পষ্ট হয় যে, তিনি কেবল একজন বিজ্ঞানমনস্ক প্রাবন্ধিকই নন, বরং বিজ্ঞান, দর্শন ও সাহিত্যের এক অনন্য সমন্বয়কারী চিন্তক। বিজ্ঞানের কঠোর সত্যকে তিনি দর্শনের ভাবনায় যেমন বিশ্লেষণ করেছেন তেমন সেই বিশ্লেষণকে সাহিত্যিক ভাষার মাধুর্যে পাঠকের কাছে সহজ ও গ্রহণযোগ্য করে উপস্থাপন করেছেন। তাঁর রচনায় যেমন বৈজ্ঞানিক যুক্তি আছে, তেমনি আছে অস্তিত্ব ও বিশ্ববোধ সম্পর্কে দার্শনিক অনুসন্ধান, এবং সেই অনুসন্ধানকে প্রাণবন্ত করে তুলেছে সাহিত্যিক

প্রকাশভঙ্গি। তাই 'জিজ্ঞাসা' কেবল একটি প্রবন্ধধর্মী রচনা নয়, বরং বিজ্ঞান, দর্শন ও সাহিত্যের ত্রিবেণী সঙ্গমস্থল।

তথ্যসূত্র:

১. বন্দ্যোপাধ্যায় শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ, দাস শ্রীসজনীকান্ত, রামেন্দ্র-রচনাবলী প্রথম খণ্ড, আষাঢ় ১৩৫৬, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, কলিকাতা-৩৭, পৃ- ২৫৫।
২. তদেব, পৃ- ২৫২।
৩. তদেব, পৃ- ৩৪৮।
৪. তদেব, পৃ- ১৭৬।
৫. তদেব, পৃ- ১৮৯।
৬. তদেব, পৃ- ১৯৭।
৭. তদেব, পৃ- ৪৩৪।
৮. তদেব, পৃ- ৪৪৬।
৯. তদেব, পৃ- ৪৭৮।
১০. তদেব, পৃ- ২০৯।
১১. তদেব, পৃ- ২৪৭।